সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 60 | No. 1-2 | 2025

Check for updates

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত-সাহিত্য সমালোচনা: পাঠ-পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

Volume	60
Issue	1-2
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Shurid Sadik
Published online	August 20, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i1-2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i1-2.10
Pages	177-200
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.10
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ১৭৭-২০০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত-সাহিত্য সমালোচনা: পাঠ-পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

সুহৃদ সাদিক
প্রভাষক, আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
ইমেইল: prokhorrudro25@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাণ্ডিত্য ছিল। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনাকর্ম হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-পাঠকে গ্রহণ করা যায়। একজন উদারনীতিক মানবতাবাদী হিসেবে তিনি চরমপন্থাকে এড়িয়ে সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর পাঠের উপর আস্থা রাখা যায়। দেশ-কাল-সমাজের প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে কখনো কায়া, কখনো মায়া, আবার কখনো কায়া-মায়ার যুগল সম্মিলনে ফুটিয়ে তুলেছেন বাক্যিক মুন্সিয়ানা। বর্তমান প্রবন্ধে *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের আলোকে একদিকে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠের পাঠপদ্ধতির তত্ত্বতালাশ করা হয়েছে, অন্যদিকে তাঁর বিশ্বাসের নান্দনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ

উপনিবেশায়ন, উনিশ শতক, আধুনিকতা, জাতীয়তাবাদ, ক্লাসিক সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য, কালিদাস, আর্য ভাষা, পাঠক-মনস্তত্ত্ব।

১

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের একজন সমঝদার পাঠক। সংস্কৃত সাহিত্য তিনি মুগ্ধতা সহকারে পাঠ করতেন। রবীন্দ্রনাথ একজন 'বিশ্ববিশ্রুত রোমান্টিক গীতিকবি' হিসেবেই তামাম দুনিয়ায় পরিচিত; এই রবীন্দ্রনাথই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন দক্ষ সমালোচকের মতো। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব-রস রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাব ও রসমাধুর্য। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, জয়দেব প্রমুখ সংস্কৃত কবি-প্রতিভার প্রত্যেকের অপরিসীম প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের পটভূমিতে নতুন ভারতের ভাবমূর্তি প্রণয়ন করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সাহিত্যেই রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ ছিল; তাঁর রচনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান রূপকার রবীন্দ্রনাথ। (Azam, 2022, p. 238) মনে করেন, দুনিয়ার অন্যতম প্রধান সৃষ্টিশীল উদারনীতিবাদী হিসেবে, কোনো প্রকার চরমপন্থাকে মেনে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের আর্দশবিরোধী। সাংস্কৃতিক বিনিময় ও মিলনেই তিনি প্রকৃত সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ খুঁজে পান। সুব্রত দাশগুপ্ত (২০০৭) একে 'shared cognitive identity' হিসেবে অভিহিত করেছেন। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ উপযোগবাদী বঙ্কিমের সঙ্গে 'ধর্মের ধারণা' ও 'সত্যের স্বরূপ' নিয়ে তিক্ত বিতর্কে জড়ালেও, ভিন্নভাবে এই সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করায় তাঁকে দিয়েছেন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড় তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন' (রবীন্দ্রনাথ ২০১৬: ৬৬৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর অরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ইংরেজি প্রবন্ধ লেখেন। 'The Bengal He Lived In' প্রবন্ধে তিনি দেখান যে, উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অভিঘাতে বাঙালির জীবন ও রুচিতে পরিবর্তন ঘটে। এই নবজাত উৎসাহ ও প্রেরণা বাঙালির সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সাথে মিলনের নতুন ভাষা খুঁজতে থাকে। অরবিন্দের অভিমত:

> The society by which Bankim was formed was the young Bengal of the fifties, the most extraordinary perhaps that India has yet seen,—a society electric with thought and loaded to the brim with passion. Bengal was at that time the theatre of a great intellectual awakening. A sort of miniature Renaissance was in the process. An ardent and imaginative race, long bound in the fetters of a single tradition, had suddenly put into its hand the key to a new world thronged with the beautiful or profound creations of Art and Learning. From this meeting of a foreign Art and Civilization with a temperament differing from the temperament which created them, there issues, as there usually does issue from such meetings, an original Art and an original civilization. (1965: 06)

অরবিন্দ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বঙ্গীয় নবজাগরণের সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের ফলে যে নতুন শিল্প-সাহিত্যের জন্ম হয় তা নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়, সেগুলোও স্বকীয়তায় ভাস্বর।

অনুরূপ কথা মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁর সাহিত্যেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সবসময় কাছাকাছি থাকে। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: ‘As for me. I never read any poetry except that of Valmiki, Homer Vyasa. Virgil, Kalidasa, Dante Tasso and Milton.’ (সাধনা ১৯৯৮: ২৯)। এখানে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যকে কোনো গুরুত্ব না দিলেও বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাসকে মধুসূদন হোমার, ভার্জিল ও দান্তের পাশে স্থান দিয়েছেন। আঙ্গিক ও ভাবধারা উভয় বিষয়েই এই মিলনের প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য* কিংবা *শর্মিষ্ঠা*—প্রতিটির বিষয়ই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গৃহীত। *মেঘনাদবধ কাব্যে* প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় যত সার্থকভাবে মধুসূদন করতে পেরেছেন, অন্য কোনো রচনায় তা সম্ভব হয়নি (বিশ্বনাথ ২০০৩: ৫৫)। অবশ্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৭) *মেঘনাদবধ কাব্যের* কাহিনি-বিন্যাসে কিংবা চরিত্র-পরিকল্পনায় প্রাচ্যের প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত:

> এই মহাকাব্যের কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রপরিকল্পনায় মধুসূদন বাল্মীকির আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শেই (বিশেষত হোমারের ‘ইলিয়াড’-এর আদর্শে) উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, তাসো, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকবিদের শিল্পপ্রণালীই তাঁর পথনির্দেশক হয়েছিল, অবশ্য কাব্যালঙ্কার ও ভাষাভঙ্গিমায় তিনি ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিদের ধারাও অনুসরণ করেছিলেন। এমন কি মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণের ও বৈষ্ণব পদাবলীরও প্রতিধ্বনি আছে। তবে এ মহাকাব্যের পরম শোকাবহ পরিণাম গ্রীক ট্রাজেডিরই অধিকতর অনুবর্তী। (১৯৯৭: ৩৭৩)

তবে এরপরও আমরা বলতে পারি, তাঁর নাট্যধারায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হলেও, কাব্যসাহিত্য থেকে তা বিলুপ্ত হয়নি। তাঁর চেতনায়-রচনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। তাই তিনি যতটা ‘মাইকেল’, ঠিক ততটাই ‘শ্রীমধুসূদন’।

মোহাম্মদ আজমের (২০২০: ৬৬) মতে, ‘একজন রোমান্টিক কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের *মেঘদূত* পড়েছেন রোমান্টিক কাব্যাদর্শের সাথে মিলিয়ে।’ ‘ক্লাসিক্যাল’ ও ‘রোমান্টিক’ শব্দ দুটিকে শুধু এক করার ক্ষেত্রে নয়, অনেক সময়ে পৃথক করারও অসুবিধা আছে। তাই শব্দগুলো প্রয়োগে বাড়তি সতর্কতা দরকার। সংস্কৃত সাহিত্যে রোমান্টিক সাহিত্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, পরিমাণে অল্প হলেও, অবাধ কল্পনার রোমান্টিক সুর শোনা যায়। ঋগ্বেদের উষা-সূক্তের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে:

> অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম।
> জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ॥ (রমেশচন্দ্র ১৩৫৮: ১১৮)

এখানে তরুণী উষাকে নর্তকী এবং ধেনুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে: 'নর্তকীর মতো তিনি উজ্জ্বল অলংকার পরিধান করেন। যেভাবে ধেনু (দোহনকালে) তার পীন পয়োধর প্রকাশ করে, তিনি সেইভাবে তাঁর বক্ষদেশ অনাবৃত করেন। নিখিল ভুবনের জন্য আলোকের সৃষ্টি করে উষা অন্ধকারকে উন্মুক্ত করেন, ধেনুরা যেমন তাদের বেড়া দেওয়া খোঁয়াড় থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে' (বিশ্বনাথ ২০০৩: ৩৮)। রবীন্দ্রনাথের গানেও এর প্রভাব আছে। বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৭) কালিদাসের কাব্যে 'কল্পনার জাদু' কিংবা 'সৌন্দর্যের দৃপ্ত' অঙ্গীকার খুঁজে পাননি, তিনি এতে প্রত্যক্ষ করেছেন কালিদাসের 'ন্যায়ধর্ম'। বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনূদিত মেঘদূতের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন:

> আশাতীতের নিরন্তর প্রত্যাশা—এই হল রোমান্টিক আর্টের সারাৎসার। ... এইভাবে দেখলে, রোমান্টিকতা শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন আর থাকে না; তা হয়ে ওঠে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের একটি চিরকালীন ধারা, যার লক্ষণ আমরা বাল্মীকি বা দান্তের মতো ধ্রুপদী কবিতেও দেখতে পাই, কিন্তু কালিদাসের ন্যায়ধর্মী মানস যাকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। (১৯৫৭: ৫৩)

তবে কালিদাসের রচনায় এই 'রোমান্টিক ম্যাজিক' বা 'fine excess' বুদ্ধদেব দেখতে না পেলেও, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন। 'কালিদাস যে সৌন্দর্যের রাজ্যে বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সৌন্দর্যের রাজ্যে গমন করেছেন স্বপ্নে ও কল্পনায় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সৌন্দর্যের রাজ্যে গমন একটা সাময়িক আনন্দময় অভিসারের মতো' (সৈয়দ আলী ১৯৯১: ৭৭)। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন রবীন্দ্রনাথকে 'নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর' শুনিয়েছে।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একটা প্রধান ব্যাপার, মূল লেখকের সঙ্গে তাঁর ভাবদৃষ্টির সাযুজ্য। ভাবদৃষ্টির এক ধরনের সাযুজ্য আছে বলেই সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এত উৎসাহ এবং কালিদাসের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত। একজন লিবারেল হিসেবে শেকসপীয়রের নাটক কিংবা টলস্তয়ের উপন্যাস তাঁর কাছে রীতিমতো পীড়াদায়ক ও ক্লান্তিকর। রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-মানস গঠনে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনচিন্তা, ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃত সাহিত্যরুচি অনেকটাই 'প্রভাব' রেখেছে। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ তেমন গুরুত্ব দেননি। একজন সমালোচক লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবই নেই, উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণেরও খুব বেশি কিছু নেই। এমন কি তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও খুব গভীর নয়। অলংকারশাস্ত্রের দু'একটি সুপরিচিত বাক্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন বটে, কিন্তু তাদের পারিভাষিক অর্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে, তাদের বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গকে সম্পূর্ণ ছাঁটাই ক'রে দিয়ে। পরিচয় গভীর হ'লে কখনোই এমন করতে পারতেন না। (সত্যেন্দ্রনাথ ২০১৫: ১৪৬)

এখানে সমালোচক মূল বিষয়টিকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিস্তর পরিচয় ছিল, পার্থক্যটা রুচিগত। আসলে রবীন্দ্রনাথ 'উদারনৈতিক মানবতাবাদের মুখোশে পশ্চিমকে আত্মস্থ করেছিলেন, আর প্রাচ্যবাদী সোনালি ভারতের আধারে সার্বিক বাণী উৎপাদনের মধ্য দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করেছিলেন "মুখশ্রী"তে' (Azam, 2023, p. 26)। সংস্কৃত সাহিত্য সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এত আগ্রহ ও চর্চার জিনিস। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রসৃষ্টিলোকে সংস্কৃতচিন্তার নিদর্শন চিহ্নিত করে সংস্কৃত

সাহিত্যের সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা হয়েছে। এটি করতে গিয়ে অবধারিতভাবে প্রাধান্য পেয়েছে একজন রোমান্টিক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যের মতো ক্লাসিক সাহিত্যপাঠের বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক ধাঁচের বিশ্লেষণ।

২

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত কোনো ব্যক্তির মূল্যায়ন যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। উনিশ শতকে বাংলায় সামাজিক পরিবর্তনগুলো স্পষ্ট রূপ পেতে থাকে (অসিতকুমার ২০০৭: ১৫)। সে সময়ের পূর্বে ধর্মচিন্তাকে সমাজচিন্তার অঙ্গ হিসেবেই দেখা হতো। প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগে দেখা যায়, ধর্মচিন্তা ও সমাজচিন্তার অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কাজেই তৎকালীন মানুষের বিচারে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটেনি। প্রসঙ্গত ওয়াল্টার উলম্যানের বক্তব্য উল্লেখ করা যাক:

> We should bear in mind that in that period man was not yet familiar with ways of thinking which are familiar and also indispensable to us. We view human activities from certain angles and put them into more or less neatly confined departments. Thus we speak of religious, moral, political, economic norms and we are inclined to say that this or that activity is religious or political, or more or so on ... But this atomization of the norms determining human actions is of rather recent date. For the larger part of the middle ages there was no such splitting up of human actions into different compartments. (1965: 16)

উনিশ শতকে কলকাতায় সংস্কৃতি তথা বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে, সমাজ-পরিবর্তনের নিজস্ব সূত্রগুলি মানব-চৈতন্যে গুরুত্ব পায় এবং ধর্মচিন্তা সমাজচিন্তা থেকে ক্রমশ বিচ্যুত হতে থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১২৮৮: ১৭৯) এই যুগকে 'Age of transition' বা 'পরিবর্তনের সময়' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সমাজ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে তিনটি দল তৈরি হয়। রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, মতিলাল শীল প্রমুখ ছিলেন রক্ষণশীল দলের। এঁরা প্রত্যেকেই 'ধর্মসভা'র সভ্য। *সমাচারচন্দ্রিকা* পত্রিকা কেন্দ্র করে এঁদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। সমাজ-সংস্কারমূলক কোনো আন্দোলনকেই এই দল সমর্থন করেনি। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার উদারনৈতিক যুক্তিবাদ গ্রহণ না করলেও এঁরা কেউই ইংরেজি শিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন না। দ্বিতীয় দলটি বিখ্যাত 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়। বাংলা ও বাঙালি আলোড়িত হয়েছে হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডি রোজিও ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা। এই দল বাংলার সামাজিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। এই দলের মুখপাত্র ছিল *জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেকটেটর* প্রভৃতি পত্রিকা। পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গলরা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মবিশ্বাসের আমূল পরিবর্তন চাইতেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন:

> হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও ... বলিতে লাগিলেন যে—এক সেলফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হইতে

> কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না। (১৯৫৭: ১৪২)

'মেকলের শিষ্যত্ব' গ্রহণ করার অর্থই হলো এঁরা বাইরে ভারতীয়, কিন্তু মনে-মগজে ইংরেজ। যাই হোক, তৃতীয় দলটি এদের সম্পূর্ণ বিপরীত। 'রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁদের মতো স্থিতধী সমাজ সংস্কারকেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সমন্বয় সাধন করে এ দেশের উপযোগী নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন' (অমিতাভ ১৯৮৯: ২৫৯)। এঁদের চেষ্টাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়।

উনিশ শতকের কলকাতায় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সময় রক্ষণশীলতার চেনা গণ্ডি অতিক্রম করে আধুনিকতায় উত্তরণের পালা চলতে থাকে। আঠারো শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বাঙালি সমাজ গ্রামনির্ভর ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে কলকাতার নবজন্ম ঘটে। ১৭৭৩ সালে কলকাতা পায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীর মর্যাদা। উল্লেখযোগ্য হারে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি-বাকরি কিংবা ভাগ্যান্বেষণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অজস্র মানুষ আসার দরুন কলকাতার জনসংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত। উনিশ শতকের বাঙালিরা অনেক বেশি সচেতন ছিলেন, যার দরুন বাঙালি সমাজে প্রচলিত অনেক কিছু তারা বিসর্জন দিয়ে দেন এবং সন্তানদের ইংরেজি শেখাতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। উনিশ শতকের বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত ব্রিটিশদের হাতে তৈরি এবং তাদের প্রতি নির্ভরশীল সম্প্রদায়। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা চেষ্টা যে একেবারেই করেনি তা নয়, তবে তা কখনোই হালে পানি পায়নি। আসলে ঔপনিবেশিক শাসনের যুক্তিবাদ ও মঙ্গলময়তার মুখোশ এই মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে প্রতারিত করেছিল। অথচ তারা তা তখন বুঝতেও পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসকরা এদের প্রায় সাহেবই বানিয়ে তুলেছিল সংস্কৃতির দিক দিয়ে। ফলে জাতিগত আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে চলছিল শুভঙ্করের ফাঁকি। একদিকে তারা ইউরোপীয় সংস্কৃতির কাছে পরাভব স্বীকার করেছিল, অন্যদিকে নিজেদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে মিলিয়ে ফেলেছিল ব্রিটিশ আনুগত্যের সঙ্গে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩) প্রশ্ন তুলেছেন, এভাবে আদৌ উপনিবেশ জাতি হয়ে উঠতে পারে কি না। আশিষ নন্দী (১৯৮৯) অবশ্য স্পষ্টভাবেই বলেছেন, সাংস্কৃতিক পশ্চিমায়ম উপনিবেশায়নের দিক থেকে কলকাতা ছিল ভারতের তীর্থস্থান।

উনিশ শতকের সেই সময় ছিল তীব্র উপনিবেশায়ন তথা পশ্চিমায়নের যুগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃতচর্চা তখন অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। উইলিয়াম জোনস, হেনরি কোলব্রুক প্রমুখ প্রাচ্যবিদ ভারতের সুবর্ণ অতীতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রাচ্য সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি স্থাপিত হয় উইলিয়াম জোনসের 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপনের মধ্য দিয়ে। শাসকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এখানে প্রাচ্যশিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য একে একে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে থাকে এই সংস্থা। উইলিয়াম জোন্স উৎসাহের সাথে ভারতীয় জ্ঞান পশ্চিমে তুলে ধরতে থাকেন। উনিশ শতক শেষ হবার আগেই জোন্স *পুরাণ*, *মনুসংহিতা*, জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* প্রভৃতি উপকরণের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ১৭৮৯ সালে কালিদাসের *শকুন্তলা* অনুবাদও করেছিলেন তিনি। হেনরি টমাস

কোলব্রুক অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রাচীন ভারতের সামাজিক স্মৃতি, প্রথা, অনুশাসন, ধর্ম ও দর্শন পাঠ করেন। প্রাচ্যবিদ্যা সাধনায় তিনি আজীবন নিমগ্ন ছিলেন। আপাতভাবে মনে হতে পারে প্রাচ্যবাদ উপনিবেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে। এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৭৮) বলেন, প্রাচ্যবাদ পশ্চিমের ক্ষমতাবিস্তার ও কর্তৃত্ব-সম্প্রসারণের একটা ধরন মাত্র। নীহাররঞ্জন রায় (১৯৮১: ৪৩৫) প্রাচ্যবাদকে 'বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রকল্প' মানতে নারাজ। তাঁর মতে, এই ডিসিপ্লিনের মাধ্যমেই প্রাচ্যকে ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রণ করা ইউরোপের পক্ষে সহজ হয়েছে। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন ১৮৩২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির ৪৭ বছর পূর্ণ হলেও এবং ভারতের ধর্ম, ঐতিহ্য, সাহিত্য, দর্শনে বিশদ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও রামমোহন রায় বা রাধাকান্ত দেবকে কিংবা কোনো ভারতীয় বুদ্ধিজীবীকে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি কেন। প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক এবং ভাবনার উদ্রেক করে। পশ্চিম এ সময়ে 'পুনর্মূল্যায়িত' হওয়া শুরু করে। আর এই নয়া-বিবেচ্য পশ্চিমের সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়োজনেই দরকার পড়ে ঘটা করে 'ভারতীয়ত্ব' আবিষ্কারের। আর এটা করার জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই ছিল একমাত্র আধার।

'ভারতীয়ত্ব' আবিষ্কারের উদ্যোগ-আয়োজন আরো গতি পায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসারের ফলে। উনিশ শতকের শেষভাগে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে, তার দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে ম্যাক্সমুলারের বিশেষ ভূমিকা আছে। ম্যাক্সমুলার বৈদিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতাকে বিচার করেছিলেন। ঋগ্বেদ তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য। ভাষা ও জাতিকে সমীকৃত করে তিনি বাঙালিদের 'আর্য' ও বাংলাকে 'আর্যভাষা' দাবি করেন। ১৮৮৩ সালে রামমোহন রায় সম্পর্কে তাঁর অভিমত:

> রামমোহন রায় আর্যজাতির দক্ষিণপূর্ব শাখার মানুষ এবং আর্যভাষা বাংলা, তাঁর মাতৃভাষা ... রামমোহন রায়ের ইংল্যান্ডে অভ্যাগমন যেন আর্যজাতির দুই মহৎ শাখার মধ্যে মিলন ঘটালো, যারা নিজেদের এক উৎস, এক ভাষা এবং এক বিশ্বাস ভুলে এতকাল পৃথকভাবে কাটিয়েছে। (থাপার ২০১১: ২৪)

তাঁর এই প্রকল্প অনুযায়ী ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ও ভাষা কার্যত বাতিল হয়েছে। কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া ব্যতিরেকেই তিনি ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকে একতরফাভাবে 'অত্যাচারী শাসন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তখন এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে ব্রিটিশ বুজুর্গরা বলতেন, 'নিপীড়নকামী মুসলিম শাসনের হাত থেকে হিন্দুগণ যে রেহাই পেয়েছে এবং পরিবর্তে হিতৈষী ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে স্থান করে নিয়েছে সে জন্য আশা করা যায় হিন্দুরা তাঁদের উপযুক্ত সমঝদার হবে' (Scholar 1984: 05)। আর্যভাষা থেকে আর্যজাতির এই সমীকরণের ফলে সংস্কৃত ভাষা হয়ে ওঠে সকল ভাষার জননী। উনিশ শতকের এলিট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই ভাবনা দারুণভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। কারণ তা ছিল তাদের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে তাঁরা তাঁদের আত্মপরিচয়ের খানা-তল্লাশি চালিয়েছেন। তাদের সামাজিক অবস্থানের বৈধতা তারা পেয়েছেন প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখিত ভারতে। রবীন্দ্রনাথের আমলে এই সকল কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবল প্রতিষ্ঠা ঘটে।

৩

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের সোপান নানাভাবে গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র মননে সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদন এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শৈশবেই ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিখতে হতো। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'মহর্ষির জীবনে যা উপলব্ধি রূপে বীজাকারে ছিল, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় তা শাখা-প্রশাখা ও ফল-ফুলে সুন্দর হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে।' তাঁর জীবনীকার জানিয়েছেন, শৈশবে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতের বুনিয়াদ খুব পাকা না হলেও, তিনি ব্যাপক অনুশীলনের দ্বারা সংস্কৃতের রসগ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন (প্রভাতকুমার ১৩৬৭: ৪০৯)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ অধিকার ছিল। তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কমিটি একাধিকবার তাঁকে সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সংস্কৃত বিষয়ের প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটিতে রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ও প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতচর্চা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতি*তে উল্লেখ করেছেন:

> পিতা আমাকে একেবারেই 'ঋজুপাঠ' দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলট-পালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছা অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু, পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই। (১৩১৯: ৬৫)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত সাহিত্যের চিরন্তনী ও মধুময়ী মায়ায় রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করেন। ফলে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অসংখ্য তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শৈশবে পিতার কাছ থেকেই উপনিষদের দীক্ষা পান। তাঁর চৈতন্যে নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল থেকে উপনিষদের বাণী তাঁকে 'বিপদে রক্ষা করেছে', সংকটে পালন করেছে ত্রাতার কর্তব্য। জমিদারি সামলাতে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে আসেন এবং দায়িত্ব সামলান। তখন তাঁর এক গভীর সৃষ্টিশীল কাল। শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা তিনি অনায়াসেই অনেকটা অতিক্রম করতে সক্ষম হন। এই পর্বে 'তাঁর উচ্ছ্বাসকে মনে হয় যেন ঋগ্বেদের স্তোত্রের অনুষঙ্গী, উপনিষদের গতিময়তায় প্রাণসৌন্দর্যচয়ন করার অধীর বাসনার প্রকাশক, কিন্তু তার বস্তুভূমি হচ্ছে পল্লীবাংলার কৃষিসংস্কৃতি ও ঋতু-প্রকৃতি' (বেগম আকতার ২০১৯: ১১)। তিনি *সোনার তরী* কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় লিখলেন:

> ওগো মা মৃন্ময়ী,
> তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
> দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
> বসন্তের আনন্দের মতো, বিদারিয়া
> এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ বন্ধ
> সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
> অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
> শিহরিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
> সচকিয়া, আলোকে পুলকে

প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্ত ভাগে। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৮৪: ১৮০)

লোকায়ত জীবনের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে নিঃসৃত হলো উপনিষদের সেই বাণী 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—চলেই চল, চলেই চল; কারণ চলাটাই সত্য।

রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকে এসে উপনিষদের চরৈবেতি মন্ত্র দ্বারা ভাবিত-চালিত হচ্ছেন। কেন্দ্র থেকে প্রান্তে আসার ফলে তাঁর চিন্তা এতটা স্ফূর্তি পেয়েছে। এখানে কবি 'সমস্ত ভূলোকে' 'প্রবাহিয়া চলে' যাওয়ার স্বপ্ন দেখলেও, কিনু গোয়ালার এঁদোগলি তাঁর অনধিগম্য অঞ্চল। পঁচিশ টাকা বেতনের হরিপদ কেরানির জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্রেণির বেড়া ডিঙিয়ে পৌঁছতেই পারে না। হরিপদ কেরানির বাসস্থানের বর্ণনায় তিনি লিখছেন:

দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।
... গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কানকা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাঁইপাশ আরো কত কী যে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০০: ১১৬)

এখানে হরিপদ কেরানির যে বাসস্থানের বর্ণনা তিনি দিলেন, তা 'বাস্তব' নয়। কবিতার প্রয়োজনে সৃজিত বাস্তব এটি। হরিপদ কেরানিদের মতো ব্যক্তিদের জীবনে 'মাঝে মাঝে' কেন, কখনোই কোনো 'সুর বেজে ওঠা'র সম্ভাবনা নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানি' গল্পটিকে স্মরণ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে (প্রেমেন্দ্র ১৯৯৯: ১-৪)। কাজেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজন করা বাস্তবকে বৈধতা দেওয়ার জন্য হরিপদ কেরানির 'ছেঁড়া ছাতা'কে আকবর বাদশাহর 'রাজছত্র' করে তোলেন; সংগীতের আড়ালে শ্রেণিসত্যকে এড়িয়ে যান।

ঔপনিবেশিক 'জ্ঞানবত্তা' ও শ্রেণিবোধে লালিত কবি সংস্কৃত সাহিত্য অন্তর্গ্রহণের ফলেই পরিশ্রুত হতে পারেন 'লোকায়তনিক' হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর কবিসত্তা গড়েই উঠেছিল 'অতীত ভারতবর্ষের অন্তঃসার', আর 'উনিশ শতকীয় ইয়োরোপের কাব্যাদর্শ ও দর্শনচিন্তার নির্যাসে'র মিথস্ক্রিয়ায়। 'ঐতিহ্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথে দেখি উপনিষদের নান্দনিক অংশের আত্তীকরণ, আর কাব্যরচনায় কালিদাসীয় সাহিত্যের প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ' (বেগম আকতার ২০১৯: ৬১)। এই সূত্রেই সংস্কৃত সাহিত্যের ক্লাসিক জগৎ তাঁর হাতে হয়েছে রোমান্টিক। উপনিষদ-প্রাণিত রবীন্দ্রনাথ আর উপনিবেশিত রবীন্দ্রনাথের তফাত না জানলে বিষয়টি বোঝা সত্যিই দুরূহ হবে। 'স্বপ্ন' কবিতায় কবি 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে' মালবিকা গড়লেও, মালবিকার সাথের কথা বলতে পারেন না। কারণ—

সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার

দুজনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর (রবীন্দ্রনাথ **১৩৫৯: ১৯**)

স্বদেশিয়ানার সূত্রে জাগ্রত আপন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-ভাবনা প্রাচীন ভারতবর্ষে খুঁজতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের কোনো বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ তাই 'সে ভাষা' ভুলতে চান না, রীতিমতো লালন করতে চান। এই অভিব্যক্তি প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠ:

> ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, ... সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। (রবীন্দ্রনাথ **১৯৬১: ৭৩৭**)

সংস্কৃতের অবাধ অধিকারের জন্য সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত হয়নি, বরং তা হয়েছে সহজ, সুন্দর এবং বিশ্লেষণাত্মক।

৪

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সহিতত্ব, মিলন, ঐক্য, নৈকট্য, সহমর্মিতা প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সত্য-সুন্দর-কল্যাণের সাধনায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন আজীবন। সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে মীমাংসকের কবিত্বশক্তি থাকা উচিত বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ। এ সংক্রান্ত একটি বহুল প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাক:

> কবিরেব বিজানাতি কবেঃ কাব্যক্রিয়াদরম।
> ন হি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্বীং প্রসববেদনাম॥

অর্থাৎ, 'বন্ধ্যার পক্ষে যেমন প্রসববেদনার মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নহে, সেইরূপ যিনি কবিত্বশক্তি হইতে বঞ্চিত, তাঁহার পক্ষেও কাব্যরচনার গূঢ় রহস্য অনুধাবন করা অসাধ্য' (বিষ্ণুপদ **১৯৯১: ৩২**)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দণ্ডী, উদ্ভট, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজ—এঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার ক্ষেত্রে রস আর প্রকাশকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিবিশেষের চিন্তার জটিলতা তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের বিশিষ্টতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য প্রথম থেকেই বিচারপন্থী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সমালোচনায় নীতিশিক্ষা ও আনন্দ, চিত্তশুদ্ধি ও রস-সঞ্চারের দিকে অত্যধিক জোর দিয়েছেন; দ্বিধাহীন চিত্তে প্রদান করেছেন ভালো-মন্দের রায়। তবে লক্ষ রাখা দরকার, সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় ধর্মীয় মূল্যকে প্রাধান্য দিলেও সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিম কখনো তা করেননি। রবীন্দ্রনাথ যে কোনো বিচারেই একজন রসগ্রাহী, বিচারশীল, সংস্কৃতি-সচেতন, বিষয়নিষ্ঠ ও তথ্যজ্ঞ পাঠক। তাই বিচারপন্থী হলেও সিদ্ধান্ত তিনি কমই দিয়েছেন; যেটুকু দিয়েছেন তাও প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ। তিনি মোটামুটি সাহিত্যের স্বাধিকারেই আস্থা রেখেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি লোকশিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও ধর্মপ্রচার ইত্যাকার সবকিছুকেই খারিজ করেছেন। তবে সংস্কৃত সাহিত্য মূল্যায়নের সময় তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত অনুপস্থিত। সেখানে নৈতিক

মূল্য বা সমাজকল্যাণের আদর্শের সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বতন্ত্রভাবে কোনো গ্রন্থকেই সাহিত্য-মূল্যের স্বীকৃতি দেননি। একজন গবেষকের অভিমত:

> রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি পড়লে, বিশেষ ক'রে 'রামায়ণ' ও 'শকুন্তলা' পড়লে, নিছক আনন্দমূল্য সম্পর্কে—সাহিত্যের আনন্দমূল্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মনে একটি প্রশ্ন জাগে। সত্যিই কি সাহিত্যমূল্য মানুষের নৈতিক মূল্য থেকে, জীবনমূল্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক? বিভিন্ন মূল্যগুলি কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ? মূল্যগুলির উৎস কি ভিন্ন ভিন্ন, না সকলেরই উৎস অভিন্ন, সকলের উৎস জীবনের গভীরতায়? 'রামায়ণে' এবং 'শকুন্তলা'য় রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য নৈতিক মূল্য, কিন্তু নৈতিক মূল্যকে সেখানে আনন্দমূল্য থেকে কিছুতেই পৃথক করা যায় না, সেখানে আনন্দ এবং কল্যাণ প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধগুলি আমাদের এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয় যে, নীতি যেখানে লৌকিক বিধিমাত্র, প্রচলিত রীতিমাত্র, সে নীতি সাহিত্যের আনন্দমূল্যকে স্পর্শ না করতেও পারে, কিন্তু যে নীতি জীবনের গভীর মূলদেশ থেকে উৎসারিত, তা আমাদের আনন্দবোধের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবনের গভীর সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যে সাহিত্যে ঘটে, সেখানে আমরা এই দুই মূল্যের পার্থক্য কখনোই স্মরণ রাখতে পারি না। (সত্যেন্দ্রনাথ ২০১৫: ২২)

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্লাসিক সাহিত্যে ব্যক্তির তুলনায় শ্রেণির প্রাধান্য লক্ষ করেছেন। মানুষের মৌলিক প্রবণতাগুলোর মধ্যে একটি আত্মপ্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা। মানবজীবনে কিংবা যুগজীবনে সংঘটিত বিচিত্র ঘটনা এবং বস্তুজগতের উপকরণ সাহিত্যের অবলম্বন হলেও, সাহিত্য অনায়াসে দৈনন্দিকতা ও প্রাত্যহিকতাকে অতিক্রম করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহির্জাগতিক প্রভাবকে অতিক্রম করতে না পারলে, একটা জাতির বা সমাজের প্রতিটি লোকের চেতনাই অভিন্ন হতো। তবে ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি হাজার রকমের ভেদ থাকলেও গোটা জাতির কিংবা নির্দিষ্ট শ্রেণির বিশেষ বিশেষ দিকে ঝোঁক থাকে। রবীন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস সেজন্যই 'সেখানে চেতন ও জড়, বাহ্য ও অভ্যন্তর, মূর্ত ও বিমূর্ত সর্ববিধ বিষয়ের স্বতন্ত্র পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিরূপ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে নাই' (বিষ্ণুপদ ১৯৯৯: ৪৭)। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন:

> আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ, দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পঙ্‌ক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লার-শোভিত সরোবর; যূথীজাতিমল্লিকামালতীবিকশিত বসন্ত ঋতু; তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃষ্টি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারি নে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য-রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ। সেইজন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৫৬: ৯৫)

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অভ্রান্ত। তাঁর গভীর অন্তদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এই মন্তব্যে। এতে একদিকে তিনি আবিষ্কার করেছেন ভারতবর্ষের বিশেষত্ব, অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য মূল্যায়নের প্রণয়ী-হৃদয়ের খেয়ালকে যুক্তির ধ্রুপদে বেঁধেছেন।

সমালোচনা-জাতীয় বিচ্ছিন্ন মন্তব্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভরপুরই রয়েছে। তবে স্পষ্ট করে বললে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক গ্রন্থ ৭টি: *সমালোচনা* (১৮৮৮), *সাহিত্য* (১৯০১), *আধুনিক সাহিত্য* (১৯০৭), *লোকসাহিত্য* (১৯০৭), *প্রাচীন সাহিত্য* (১৯০৭), *সাহিত্যের পথে* (১৯০৭) ও *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪১)। এগুলো ছাড়াও *বিবিধ প্রসঙ্গ* (১৮৮৩), *পঞ্চভূত* (১৮৯৭), *বিচিত্র প্রবন্ধ* (১৯০৬), *ছিন্নপত্র* (১৯১২), *ছন্দ* (১৯৩৬), *বাংলাভাষা পরিচয়* (১৯৩৮) প্রভৃতিকে গৌণ আকর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রবন্ধের মূল বিষয় প্রতিপাদন করতে গিয়ে অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলেও, বর্তমান প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে মুখ্যত *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের মধ্যেই।

৫

প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকে 'পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেনের *রামায়ণী কথা*র ভূমিকা হিসেবে, ১৬১০ সালে। পরে এটি *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বাল্মীকির কাব্য-সৌন্দর্যকে ক্রমিক পদক্ষেপে উন্মোচিত করেছেন, আর নিজে অবগাহন করেছেন প্রাচীন ভারতের শাশ্বত ভাবধারায়। তখনকার দিনে সাহিত্য-নির্মাণ ছিল ছকে বাঁধা, শূন্যগর্ভ এক বিশুদ্ধতার প্রতীক। কিন্তু বাল্মীকির *রামায়ণে* ভারতীয় সমষ্টি-জনচেতনার সাহিত্যরূপ মহিমময় হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রভাবশালী ইংরেজ লেখক ম্যাথু আর্নল্ড (১৯৩২) *Culture and Anarchy* নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থে সংস্কৃতির দুটি দিকে আলো ফেলেছিলেন—মাধুর্য ও জ্যোতি। এই জ্যোতির কথা বিবেচনায় রেখে রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৬: ১৬) লিখেছিলেন, 'কমল হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার।' 'রামায়ণ' প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ কবি ও মহাকবির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে এগুলোই যে আমাদের সংস্কৃতির আদি উৎস তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৬: ১৬) মহাকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'আর এক শ্রেণীর কবি আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।' দেশকালের অখণ্ড রূপই শুধু নয়, মহাকাব্যে আপামর ভারতবাসীর ঘরের কথাই স্থান পেয়েছে। *রামায়ণের* প্রধান চরিত্র রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রের ভালোমন্দ যাচাই না করে, রবীন্দ্রনাথ এদের আদর্শের উৎস-সন্ধান করে বিশ্লেষণ করেছেন।

ভারতবর্ষের চিরকালীন আদর্শ সমন্বয়। ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াসে ভিনসেন্ট স্মিথ (১৯১৪) লিখলেন 'Unity in Diversity'। ভারতীয় স্বাদেশিকতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই বক্তব্যের সমর্থকরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, ভারতীয় সভ্যতা ঐতিহ্যগতভাবে সহনশীল। পরস্পরবিরোধী জাতিগোষ্ঠীও এখানে শান্তিতে সহাবস্থান করেছেন। জওহরলাল নেহরুও এই মতের সমর্থক। ভারতীয় সমাজের সমন্বয় প্রচেষ্টার স্বরূপ উন্মোচন করতে তিনি শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে তাদের জাতীয়তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখতেন। 'সত্যিকারের ভারতীয়' হতে গেলে সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত জরুরি। *রামায়ণ-মহাভারত* তাঁর কাছে কেবল মহাকাব্য নয়, ইতিহাসও বটে। তবে এগুলো 'ঘটনাবলি'র ইতিহাস নয়, এগুলো 'ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস'। *রামায়ণে* দেবতার কথা বলা হয়নি, সেখানে বিবৃত হয়েছে মানুষের

কথা। *রামায়ণে* বীর রস নয়, মুখ্য হয়ে উঠেছে বাৎসল্য রসই। এই মহাকাব্যে দেবতা নিজেকে ম্লান করে মানুষ হয়নি, মানুষই নিজের গুণে হয়ে উঠেছে দেবতা। রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন: 'মানুষেরই চরম আদর্শ-স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শচরিত-বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।' (১৩৫৯: ৮-৯)

সমালোচনার বিষয়ে রসোপভোগের পরিধি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পরুচি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কবিতার ভাষার সঙ্গে তাঁর এই প্রবন্ধের গদ্যের ভাষার তেমন পার্থক্য নেই। তাঁর লেখায় ঔদার্য, সততা ও নিষ্ঠা ছিল। বাল্মীকি ও *রামায়ণের* মূল্যায়ন করে একদম শেষে তিনি লিখেছেন: 'পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তবসত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই' (১৩৫৯: ১২)। এই মন্তব্যে জাত-পাত বিবর্জিত ভক্তিবাদী আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতায় বিশ্বাসী। *রামায়ণ* তাঁর কাছে সকলের এক হওয়ার মননমন্ত্র হিসেবে বিবেচিত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, মানুষ আলোর সন্তান, আর ঈশ্বরের বাস মানুষের হৃদয়ে। রবীন্দ্রনাথ সবকিছুতেই তাই সত্য-সুন্দর-কল্যাণের ধারক ঈশ্বরকে পেতেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী গুরু কবির লিখেছেন:

> জব মৈঁ ভূলারে ভাঈ,
> মেরে সতগুর জুগত লখাঈ॥
> কিরিয়া কর্ম্ম আচার মৈঁ ছাঁড়া,
> ছাঁড়া তীরথকা নহানা।
> সগরী দুনিয়া ভঈ সয়ানী,
> মৈঁহী ইক বৌরানা॥
> না মৈঁ জানূঁ, সেবা বংদগী,
> না মৈঁ ঘন্ট বজাঈ।
> না মৈঁ মূরত ধরী সিংঘাসন,
> না মৈঁ পুহুপ চঢ়াঈ॥
> না হরি রীঝৈ ধোতী ছাঁড়ে,
> না পাঁচো কে মারে॥
> দয়া রাখি ধরম কোন পাল,
> জগ সোঁ রহৈ উদাসী॥
> আপনা সা জীব সব কো জানৈ,
> তাহা মিলৈ অনিবাসী॥
> সহৈ কুশব্দ বাদকো ত্যাগৈ
> ছাঁড়ৈ গর্ব্ব গুমানা।
> সত্ত নাম তাহি কো মিলিহৈ
> কহৈঁ কবির সুজানা॥ (সুবোধচন্দ্র ২০১৮: ১৪২)

প্রসঙ্গত ক্ষিতিমোহন সেনের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো:

> হে ভাই, যখন আমরা ভুলিয়াছিলাম তখন সেই আমার সদগুরুই আমাকে যুক্তিযুক্ত পথ দেখাইয়াছেন। আমি তখন ক্রিয়াকর্ম্ম আচার ছাড়িলাম—তীর্থে তীর্থে স্থান ছাড়িলাম। তখন

> দেখি কি সমস্ত সংসারই মহাজ্ঞানী, আমিই একা পাগল, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। সেদিন হইতে আমি না জানি দণ্ডবত প্রণাম—না বাজাই ঘণ্টা—না আমি পুষ্পের দ্বারা কোন প্রতিমা অর্চ্চনা করি।
> জপতপ করিয়া দেহকে দগ্ধ করিলেই হরি তৃপ্ত হন না—পঞ্চেন্দ্রিয়কে বধ করিয়া বসন ত্যাগ করিলেই হরি তৃপ্ত হন না।
> যে দয়ালু ধর্ম্মকে পালন করে, জগতের মধ্যে উদাসীন থাকে, সকল জীবকে আত্মবৎ জ্ঞান করে, সেই অমৃতপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। যে অপমান সহ্য করে, কু-কথা ত্যাগ করে, সকল গর্ব্ব হইতে মুক্ত, কবির কহেন, সেই সত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। (ক্ষিতিমোহন ২০১০: ৩৩-৩৪)

রবীন্দ্রনাথ ভক্তিবাদী আন্দোলনের শ্রেণিগত চরিত্রটি বেশ ভালোভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। সেকালে সমাজের প্রান্তিক ও ব্রাত্যজন প্রথাগত ধর্মের বিকল্প হিসেবে নিজেরাই যে ভক্তিবাদকে নিজেদের করে নিয়েছিল, তার স্বরূপ নিরূপণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের সাধক কবিদের অন্তর থেকে গানের উৎস এমনি করেই খুলেছে। তাঁরা রামকে, আনন্দ স্বরূপ পরম একককে আত্মার মধ্যে পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় অন্ত্যজ, সমাজের নিচের তলাকার, পণ্ডিতদের বাঁধা মতের শাস্ত্র, ধার্মিকদের বাঁধা নিয়মের আচার তাঁদের কাছে সুগম ছিল না। বাইরের পূজার মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলনমন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন' (ক্ষিতিমোহন ২০১৩: ৬৪-৬৫)। রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সাংস্কৃতিক রাজনীতির মৌলনীতির তত্ত্বতালাশ বেশ ভালোভাবেই করেছিলেন। 'রামায়ণ' প্রবন্ধটি তাই কেবল *রামায়ণের* আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ভাবনার অনন্য স্মারক।

ভারতবাসীর কাছে গৃহাশ্রমের ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে—জীবনচর্যা ও আদর্শ দুদিক থেকেই। ভারতীয় জীবন-ভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্গের কথা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি ভাববস্তু নিয়েই সমষ্টিগত মানবজীবনের পূর্ণতা। ধর্ম কথাটির তাৎপর্য আরো বেশি। বৈদিক সাহিত্য পুরোপুরিই ধর্ম দ্বারা অনুশাসিত। 'ধর্ম' এসেছে ধৃ ধাতু থেকে, যার অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা। এটি কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে দেখেছেন 'মিলনের সেতু' হিসেবে। গৃহাশ্রম ধারণ করে রেখেছিল পুরো সমাজকে। আমাদের প্রকৃত পরিচয় অনেকখানি নির্ভর করে গৃহাশ্রম ও গৃহধর্মের উপর। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *রামায়ণে* ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অপর কোনো দেশের সাহিত্যে তা হয়নি বলে ধারণা রবীন্দ্রনাথের। তিনি লিখেছেন:

> রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। ... পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। (১৩৫৯: ১২)

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে আশ্রম রয়েছে চারটি: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য হলো শিক্ষাজীবন, গার্হস্থ্য সংসারজীবন, তৃতীয়টি বিশ্বপর্যটন আর চতুর্থটি সবকিছু শেষ করে মোক্ষের সন্ধান। গার্হস্থ্যজীবনেই মানবীয় জীবনসাধনার স্থিতি। *রামায়ণে* গৃহ ও পরিবারই মুখ্য। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী—এদের আদর্শ কেমন হওয়া উচিত তা শিখিয়েছে *রামায়ণ*। *রামায়ণ*কে তাই গৃহাশ্রমের কাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

৬

প্রাচীন ভারতবর্ষের কবিকুলগুরু কালিদাসের *মেঘদূত* সর্বকালের কাব্যরস পিপাসুরাই সাদরে গ্রহণ করেছেন। *মেঘদূত* বারংবার পাঠ ও উদ্ধৃত করার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাল হতে কালান্তরের সঙ্গে সেতুবন্ধন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল রচনায় সরাসরি বা কোনো গ্রন্থের বরাত দিয়ে হলেও কালিদাস হাজির আছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিল্পসফল কাব্যগ্রন্থ *মানসী*। এ কাব্যে 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল' (রবীন্দ্রনাথ ১২৮১: ৮)। সেই *মানসী* কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা সংকলিত করেছেন। এটি রচিত হয়েছিল ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠ। এই কবিতা রচনার প্রায় দেড় বছর পরে 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। দুটি রচনাই কালিদাসের অমর কাব্য *মেঘদূতের* প্রেরণাতেই রচিত। *মেঘদূত* এতটাই জনপ্রিয় কাব্য যে, পরবর্তী সময়ে 'মেঘদূতে'র অনুকরণে ৫০টিরও বেশি দূতকাব্য রচিত হয়েছিল (মুমতাহানা ২০২০: ৪৬)। এগুলোর মধ্যে *হংসদূত, পিকদূত, চন্দ্রদূত, ইন্দ্রদূত, পদাঙ্কপদূত, তুলসীদূত, মনোদূত, ভক্তিদূত*, *হৃদয়দূত* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে সার্থক অনুকরণ মহাকবি ধোয়ীর পবনদূত (কানাই লাল ১৯৯৪: ১২-১৩)। তবে রবীন্দ্রনাথের আগের বা পরের কোনো সাহিত্যিকই তাঁর মতো কালিদাসের ভাবধারাকে এমন প্রত্যক্ষ ও বিশ্বস্তভাবে আত্মস্থ করে এত বিচিত্র মাত্রায় কাজে লাগাতে পারেননি (পম্পা ১৯৭২: ১৪৬)। 'মেঘদূত' প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ *মেঘদূতের* একটি হৃদয়গ্রাহী রসমূর্তি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নতুন সৌন্দর্যের আঁচড় কেটেছেন। সৌন্দর্যের অনুভূতি যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিনিষ্ঠ নয়, তা বিবেচনায় রেখে তিনি কালিদাসের সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কালিদাসের যুগেরই একজন হিসেবে ঠাওরেছেন। কুবেরপুরবাসী যক্ষের মতো তিনি নিজেও যেন তাঁর আরাধ্য সাধনাক্ষেত্র থেকে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক অসুন্দরের মধ্যে নির্বাসিত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের বিরহী যক্ষের অন্তর্বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বেদনা সমীকৃত হয়ে তা অতলস্পর্শ বিরহ-বাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের অভিমত:

> মহাকবি কালিদাসের দূরাগত বাণীমূর্চ্ছনা সমানধর্মা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রীতেই অপূর্ব অনুরণন জাগাইয়াছিল। ... বস্তুত, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের এই পরস্পর সমধর্মিত্ব শুধু উভয়ের প্রতিভা ও অন্তর্জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। আমার দৃষ্টিতে উভয়ের বহির্জীবনেও এই সমধর্মিত্ব যেন সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান। দুইজনেই শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্ধাভিষিক্ত—সেইজন্যে দুইজনেরই কাব্যজগৎ রসময়। (১৯৭৮: ০৮)

কালিদাসের চিন্তার ঋজুতা ও সাধনার শক্তি রবীন্দ্রনাথকে মায়ায় বেঁধেছিল। তাই তিনি বারংবার বাঁক ফিরে *মেঘদূতে*র দৃশ্যাদৃশ্য স্রোতে বিসর্পণ করেছেন। কালিদাস ভারতবর্ষের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে খ্যাত গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজসভার কবি ছিলেন। সে সময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সংহতি রক্ষায় বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। মৌর্যযুগের অতিকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করে গুপ্ত শাসকরা কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি দৃঢ় হয় এবং স্থানীয় ঔপজাতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হলে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয়। শিল্প অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ঈর্ষণীয় উন্নতি ঘটে এ সময়। অজন্তার গাত্রে আঁকা সমস্ত চিত্রই এ যুগের নির্দশন। এ সময় তিন মহলা, তিন প্রস্থে মন্দির নির্মাণের স্থাপত্যরীতি যাত্রা শুরু করে। অজয়গড়ের পার্বতী মন্দির, সাতনার একলিঙ্গ মন্দির, ভিতারগাঁয়ের ইটের তৈরি মন্দির এর উদাহরণ। তাছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতির ফলে গুপ্তযুগে সাধারণ মানুষও সচ্ছলতা ও বিলাসে জীবন কাটাত (অজিত ও ফয়েজুন্নেছসা ১৩৯১: ৩-৪)। যুগের এই ঋদ্ধি প্রতিভাসিত হয়েছিল কালিদাসের কাব্যে। তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতার আলোকেই স্বর্গপুরী অলকার চিত্র আঁকেন। উজ্জয়িনী নগর ও অলকা একাকার হয়ে যায় তাঁর কাব্যে। কালিদাসের যুগের সমৃদ্ধি আর আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথকে বারবার টেনেছেন। বৈদিক কবিরা প্রোপাগ্যান্ডার কাজে সাহিত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই সেগুলো রবীন্দ্রনাথ তেমন গ্রহণ করেননি।

ঋগ্বেদে বর্ষা হচ্ছে সঞ্জীবনী ঋতু; এটির কাজ নবজীবনের আশ্বাস বহন করা। *বেদে*র কবি তাই বর্ষার মেঘমালাকে কল্পনা করেন 'পর্জন্যদূতরূপে':

> রথীব কশায়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্ন্
> আবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
> দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
> যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥

অর্থাৎ 'রথারোহীর মতো কশাঘাতে ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে তিনি বর্ষার দূতদের বের করেন। দূর থেকে সিংহের গর্জন ওঠে—যখন পর্জন্য আকাশ বর্ষণোন্মুখ করে দেন' (সুকুমার ১৯৯৬: ১১)। *মেঘদূত* এর চেয়ে আলাদা। *মেঘদূতে* বর্ষা কেবল 'জীবন-ভরসা'র নয়, বরং 'মিলন-আশা'র প্রতীক। 'সে কারণে *মেঘদূতে* পর্জন্যের বাহন নিজেই বিরহসন্তপ্তের শরণ লইয়া, বিরহিণীর কাছে সমাশ্বাস বহন করিয়া যাইবার পথে উৎগৃহীতালকান্তা পথিকবনিতাদের আসন্ন প্রিয়সমাগমের প্রত্যয় দিতে দিতে চলিয়াছে' (দেবনাথ ২০১৫: ৮)। এ রকম চিরন্তন তাৎপর্যে মহিমান্বিত করে যক্ষের বিরহকে প্রকাশ করতে পারার জন্যই কালিদাস 'বিশেষ কালের রাজসভার কবি হয়েও শাশ্বতকালের সারস্বত সভার কবি' (দেবনাথ ২০১৫: ৮)। রবীন্দ্রনাথের প্রতিমান বিরাটত্বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসে গিয়েছে কালিদাসের শব্দ, বাগ্‌ভঙ্গি আর চিত্র। কালিদাসের কাব্যকৌশলের চুনকামে তিনি নিজের কবিতাকে মণ্ডিত করতে চেয়েছেন। *মানসী*র 'মেঘদূত' ছাড়াও *কল্পনা* কাব্যের অনেকগুলো কবিতায় এ কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার কয়েক পঙ্ক্তি:

> মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
> কোথা তোরা অভিসারিকা!
> ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,

> ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
> আনো বীণা মনোহারিকা।
> কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা! (রবীন্দ্রনাথ ১৩৫৮: ১২)

এখানে বর্ষাযাপনের ছায়াপাত সুগোচর হচ্ছে। তবে চরিত্র আর বাদ্যযন্ত্রের একটিও এ কালের নয়। বর্ষাযাপনকে রবীন্দ্রনাথ 'স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার' প্রশ্রয়ে কালিদাসের সাথে সুন্দর ও রোমান্টিকভাবে মিলিয়েছেন। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে তাই এসেছে:

> কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপবীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। ... যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে তবে সেই আমার বহুভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৫৯: ১৬)

রবীন্দ্রনাথ এখানে মানুষের যে নিত্য বিরহের কথা বলেছেন, তার খোঁজ তিনি রামগিরির যক্ষের মধ্যেই পেয়েছেন।

মেঘদূত কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে কালিদাস অসামান্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। তবে *মেঘদূতে*র শৃঙ্গারে ভোগের প্রাবল্য ও প্রাধান্য পরিলক্ষিত। তাঁর মতো শব্দের মধ্য দিয়ে জীবন্ত চিত্র সৃষ্টি করার নিপুণ কারিগর বিশ্বসাহিত্যে খুব কমই আছেন। এক একটি ছত্রে, এক একটি ছত্রাংশে তিনি লেখনীর তুলিকায় প্রাণবন্ত চিত্র তৈরি করেন। রূপকল্প প্রয়োগ ও পরিবেশ সৃষ্টির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ কালিদাসের শরণ নিয়েছেন গুণমুগ্ধ ভক্তের মতো। তবে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু একজন রোমান্টিক এবং সৃষ্টিশীল লিবারেল, তাই কালিদাসের কাব্যে অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনার সুর শুনতে পেয়েছেন। কল্যাণী শঙ্কর (১৯৮০: ১৭০) প্রশ্ন তুলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতকে কি বৈষ্ণবী দৃষ্টিতে দেখেছেন?' তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গির খানিকটা সমালোচনাও করেছেন। আসলে কালিদাস একজন জীবনবাদী কবি। ইন্দ্রিয়জগৎ তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়জগৎই; কোনো অতীন্দ্রীয় জগতের প্রতি তাঁর আলাদা প্রীতি ছিল না। তিনি মাটির পৃথিবীর কবি। সুকুমার সেন (১৯৯২: ১৩৮) পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, 'কালিদাসের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যরস অতিমর্ত্য ও অধ্যাত্মভূমি হইতে মর্ত্য ও পার্থিব ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে।' কাজেই কালিদাসের কাব্যের প্রাণ ধূলির ধরার নর-নারীর মর্ত্যপ্রীতি ও জীবনতৃষা। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রেমের মুক্তি এবং তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মুক্তি। *মেঘদূত* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ উন্মোচন করে শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন:

> কালিদাস অসীমকে যতটা পারেন সীমার ভিতরে বাঁধিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সীমাকে যতটা পারেন অসীমের ভিতর মুক্তি দিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বজগৎকে মানুষের বাস্তব সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, আশা-নিরাশার রঙে রাঙাইয়া দিয়া দূরের জিনিসকে একান্ত কাছের করিয়া তোলাই কালিদাসের বৈশিষ্ট্য; অপর দিকে তথাকথিত বাস্তব জীবনের ছোট-খাট যাহা কিছু সকলকে শুধু বিশ্বজীবনের নিঃসীমতার রহস্যলোকে টানিয়া লইয়া তাহাকে অনির্বচনীয় মহিমা দান করাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। (১৩৯৬: ২০২-২০৩)

মেঘদূত কাব্যে প্রকৃতির পার্থিব ও স্বর্গীয় রূপ, প্রেমের গভীরতা, বিরহের অভাবিত স্মৃতি, হৃদয়ের কারুণ্য বিচিত্র সৌন্দর্যের পথ উন্মোচিত করে। রবীন্দ্রনাথ কল্পনার মধ্য দিয়ে সে পথে পা বাড়ান এবং এর প্রকৃতিলিপ্ততা দেখে দারুণভাবে মুগ্ধ হন।

৭

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সার্থক গদ্যরচনার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেলেও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে তার আবির্ভাব অনেকটাই বিলম্বিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাব্য-মহাকাব্য আদি সমুদ্র দ্বারাই যেন গদ্যের সামান্য ভূভাগ বেষ্টিত ছিল। গদ্যকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে দণ্ডী, সুবন্ধু এবং বাণভট্ট এই তিনটি মাত্র নামই স্মৃতিতে বিরাজমান, অপরদের নাম চেষ্টা করে স্মরণে আনতে হয়। এঁদের মধ্যেও বাণভট্ট রচিত *কাদম্বরী* নামক কথা-জাতীয় গদ্যকাব্যটিই সমকালে এবং পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ গদ্যের নিদর্শনরূপে কীর্তিত হয়ে আসছে। 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের এই *কাদম্বরী* গদ্যকাব্যের ভাবসম্পদ ও শব্দশৈলীকে স্বকীয় ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

বাণভট্টের *কাদম্বরী* কথা-জাতীয় গদ্যকাব্য, এর কাহিনি কবি-কল্পিত এবং এটি গদ্যে রচিত। আধুনিক কালের উপন্যাসের সঙ্গে এর একটা সুস্পষ্ট সাদৃশ্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। অনেক সমালোচকই *কাদম্বরী*কে সংস্কৃত সাহিত্যের উপন্যাসরূপে অভিহিত করতে চান। *কাদম্বরী*র এই উপন্যাস লক্ষণ দর্শনেই সম্ভবত মারাঠী ভাষায় 'উপন্যাস' তথা ইংরেজি Novel-এর প্রতিশব্দরূপে 'কাদম্বরী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট সাহিত্যতাত্ত্বিক Ralph Fox-এর একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য:

> The Novel is the epic form of our modern bourgeois society. It did not except in very rudimentary form before that modern civilization which began with the renaissance and like every new art form it have served its purpose of extending and deepening consciousness. (1937: 12)

একটা জাতির জীবনে নবজাগৃতির সূচনার প্রতীক্ষায় থাকে উপন্যাস এবং এ জাতীয় জাগৃতি নতুন কালের সমাজ-পরিবেশেই সম্ভব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও সমাজ-সচেতনতা ব্যতীত এ জাতীয় নবজাগৃতি সম্ভব নয়, এবং এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত থাকে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা। সদ্য-কথিত জীবন-জিজ্ঞাসা ব্যতীত উপন্যাসে অপর যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, তাদের অধিকাংশই অল্প পরিমাণে *কাদম্বরী, দশকুমারচরিত* এবং *বৃহৎকথা*র কোনো কোনো কাহিনিতে বর্তমান থাকায় শিথিল উক্তিতে এই কাব্যগুলোকে 'উপন্যাস' অথবা 'উপন্যাস জাতীয় কাব্যে'র মর্যাদা দান করা হয়। সাধারণভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল কাহিনিই ধর্মাশ্রয়ী, অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃতধর্মী। মৃত্তিকার ঘ্রাণে ভরপুর এবং লৌকিক জীবনাশ্রয়ী হওয়ায় *কাদম্বরী* এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকেও *কাদম্বরী*কে উপন্যাসায়িত করতে পেরেছেন বাণভট্ট। কাব্যের প্রধান চরিত্র চন্দ্রাপীড়, বৈশম্পায়ন, মহাশ্বেতা এবং কাদম্বরী—কেবল আদর্শ-রূপেই নন্দিত নয়, এগুলো পরিপূর্ণও বটে। গ্রন্থটিতে একাধিক কাহিনি থাকলেও পত্রলেখা কোনো কাহিনির নায়িকা নয়। স্বর্গ থেকে স্বয়মাগতা চন্দ্রপ্রিয়া রোহিণীই রাজা চন্দ্রাপীড়ের তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখারূপে আবির্ভূত হয়। পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের দিগ্বীজয় কালেও ছিল সঙ্গিনী। চন্দ্রাপীড়ের প্রতি কাদম্বরীর প্রণয়ের কথা

পত্রলেখাই প্রকাশ করেছিল। কাহিনিতে পত্রলেখার কোনো মুখ্য ভূমিকা নেই, অথচ তৎসত্ত্বেও চরিত্রটির আকর্ষণ এত প্রবল যে রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, চরিত্রটি ‘কাব্যে উপেক্ষিতা’ হয়ে রইল। একটি অপ্রধান চরিত্রের এই আকর্ষণযোগ্যতা নিশ্চয় এর মাহাত্ম্যেরই প্রকাশক। বস্তুত কালোচিত বিচারে *কাদম্বরী* যে উপন্যাস নামে অভিহিত হয়ে থাকে, তার যাথার্থ্য মেনে নেওয়াই সঙ্গত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও *কাদম্বরী*কে উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন: ‘সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে তাহাদের মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে’ (১৩৫৯: ৬১)। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই সোৎসাহে এর বিস্তৃত পরিচয় দান করেছেন।

বাণভট্ট চিত্রের পর চিত্র এঁকে কাহিনিকে গতি দিতে চেয়েছেন। সেই গতি কখনো মন্থরতা লাভ করেছে বটে, কিন্তু তাতে কাহিনিতে কোনো শৈথিল্য দেখা দেয়নি। চিত্র রচনায় তিনি কখনো পুনরুক্তি করেননি; তাঁর চিত্র রঙে-রসে বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ *কাদম্বরী*কে বলেছেন একটি ‘চিত্রশালা’। সংস্কৃত কাব্য-নাটক এবং গদ্যকাব্যে নর-নারীর প্রেম বর্ণনায় কবিদের যে নিরঙ্কুশ মনোভাবের পাওয়া যায়, বাণভট্ট সেখানে যথেষ্ট সংযত-সংহত; তাঁর রচনায় তির্যক কামনা কখনো প্রশ্রয় লাভ করেনি। কাদম্বরীর একনিষ্ঠতা, মহাশ্বেতার প্রেম-তপস্যা কিংবা উপেক্ষিতা পত্রলেখার নির্লিপ্ততা—সংস্কৃত সাহিত্যে এদের তুলনা তারা নিজেই। প্রধান নায়ক-নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে কবি অসাধারণ কুশলতা দেখিয়েছেন; এমনকি গৌণ চরিত্র পত্রলেখাও এমন আকর্ষণীয়ভাবে সৃজিত যে, গ্রন্থশেষে রবীন্দ্রনাথের মতো সমালোচককেও তার জন্য ব্যাকুল হতে হয়েছে, ফেলতে হয়েছে দীর্ঘশ্বাস।

৮

সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অবস্থান, বাঙালি জীবনে রমণীর স্থান এবং নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের দেশীয় পটভূমিকায় নারীদের জীবনচর্চা ও জীবনবোধ বিষয়ে সচেতন পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আত্মিকতার ভূমিতে নারীদের পৌঁছে দিতে চান তিনি। উনিশ শতকে মধুসূদন দত্ত তাঁর *বীরাঙ্গনা কাব্যে* কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা দেখিয়েছেন (ক্ষেত্রগুপ্ত ১৩৯১: ২৮৬)। রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’কে সৃষ্টি করেছেন একদম আলাদাভাবে। চিত্রাঙ্গদার চরিত্র মেয়েদের ভাবনা-জগতের পরিধি বর্ধিত করেছে। আত্মপ্রকাশের প্রেরণা থেকে তার সেই বিখ্যাত উক্তি:

> আমি চিত্রাঙ্গদা।
> দেবী নহী, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
> মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
> যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
> যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
> আমার পাইবে তব পরিচয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০১৬: ২৫৫)

এখানে চিত্রাঙ্গদা দেবী নয়, দাসী নয়; সে এক স্বাধীন সত্তা। নারীদের দুঃখ ও অবমাননায় রবীন্দ্রনাথ বেদনা ও লজ্জা বোধ করেছেন। *বীথিকা* কাব্যের 'অপ্রকাশ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, মেয়েরা নিজেরাই বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হবে বহুযুগ ধরে বহন করে চলা সংস্কারের কারাগার থেকে। কোনো নারীই তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষুদ্র নয়। 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যে উপেক্ষার শিকার চারটি নারী চরিত্র—*রামায়ণে*র ঊর্মিলা, *অভিজ্ঞানশকুন্তলমে*র অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এবং *কাদম্বরী*র পত্রলেখার মাহাত্ম্যের কথা গভীর হৃদয়ানুভূতি সহযোগে ব্যক্ত করেছেন। সময়ের হাতে একজন লেখক কতখানি ঘাতসহ, সে বিচারের উপরই নির্ভর করে তিনি কতখানি আধুনিক। ব্যক্তি ও সমাজ সংক্রান্ত এক স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতার যে ভাষ্যের তিনি ভাষ্যকার, সমাজ-ব্যক্তি-অন্বয় বোধের সেই বিশিষ্টতার আলোকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক। তাই কাব্যে 'অল্প সময়ে'র জন্য উপস্থিত, ক্ষুদ্র ভূমিকা পালনকারী এসব নারীকে তিনি 'সামান্য' হিসেবে দেখেননি, বরং মন্তব্য করেছেন, 'পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৫৯: ৭৩)। ধর্মনিরপেক্ষ মেট্রোপলিটন নগরী হিসেবে কলকাতার প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও সেই শহরের বর্ণীয় অনুশাসনবিমুক্ত ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম সঞ্চয়ের মধ্যে নতুন কালের স্পন্দিত অভিজ্ঞান রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যে স্পষ্ট।

রামায়ণ সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সম্পদ বিশেষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এর চরিত্র ও উপাখ্যানের সঙ্গে পরিচিত। এই মহাকাব্যে রাজা দশরথের পারিবারিক ঘটনা কবির কলমে বিন্যস্ত হয়েছে। দশরথপুত্র রামের জীবন-বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করেই মূলত কাব্যটি গঠিত হয়েছে। মহাকাব্যের অতিরিক্ত বিষয় এতে তেমন প্রযুক্ত হয়নি। যদিও মূল ঘটনাকে দৃঢ় করার জন্য স্থানে স্থানে উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে, তথাপি কাব্যস্থিত উপাদানসমূহ মূল ঘটনাপ্রবাহকে ব্যাহত করেনি। ভারতবর্ষের মানুষ চিরকাল *রামায়ণে*র কবিকে ত্রেতাযুগের এবং রামের সমসাময়িক বলে বিশ্বাস করে এসেছে। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে রাম একজন আদর্শ রাজা এবং সমগ্র কল্পনীয় গুণের আধার বিশেষ। সীতা রমণীর মহত্তম ধর্ম দাম্পত্য-প্রেম ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের *মহাভারতে* অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের মতো সীতার নামও বারবার এসেছে; কিন্তু ঊর্মিলার নাম আসেনি। রবীন্দ্রনাথ এটাকে ঊর্মিলার প্রতি অবিচার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কৌঞ্চ-বিরহিণীর বৈধব্য যাতনায় শোকে আকুল বাল্মিকীর এই অবিচার রবীন্দ্রনাথের জন্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ঊর্মিলা রাজা জনক ও সুনয়নার একমাত্র কন্যা; মহাত্মা লক্ষ্মণের স্ত্রী। লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলার অঙ্গদ ও ধর্মকেতু নামে দুই পুত্র সন্তান ছিল। রাম ও সীতার সঙ্গে নির্বাসনে যাওয়ার জন্য ঊর্মিলা প্রস্তুত থাকলেও লক্ষ্মণ তাকে নেয়নি। লক্ষ্মণ তাকে রাজা দশরথ ও রাণীদের সেবার জন্য রেখে যায়। সীতা ও স্বামী লক্ষ্মণের জন্য ঊর্মিলার এই আত্মত্যাগ মহাকবি বড় করে দেখাননি। সীতার চোখের জলে ঊর্মিলা ভেসে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একজন চরিত্রবান লিবারেল হিউম্যানিস্ট হিসেবে ঊর্মিলার পক্ষে হৃদয়ের করুণা ঢেলে লিখেছেন:

> কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর-একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের-সর্বসুখ-বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি-কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না! হায় অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবারমাত্র উদিত

> হইয়াছিলে, তারপরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় বা তোমার অস্তশিখরী তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল। (১৩৫৯: ৭৩)

বাণভট্টের *কাদম্বরীর* পত্রলেখাকে অত্যন্ত সহমর্মিতা সহকারে হাজির করেছেন রবীন্দ্রনাথ। উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড় কুলুত জয় করে তথাকার রাজকন্যা পত্রলেখাকে নিয়ে এল রাজপুরীতে। রাজমহিষী বিলাসবতী তাকে কন্যা-নির্বিশেষে প্রতিপালন করে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ের তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী করে দিল এবং বলে দিল, রাজপুত্র তার সঙ্গে যেন প্রিয়সখীর মতো ব্যবহার করে। তদবধি পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের অভিন্নহৃদয়া সখীর স্থান অধিকার করে। এই সখিত্বের মধ্যে কোনো আড়াল ছিল না। উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্তে থেকেই পত্রলেখা দিন-রাত উপবেশনে-উত্থানে-ভ্রমণে ছায়ার মতো চন্দ্রাপীড়ের নিত্যসঙ্গিনী। তার দৈনন্দিন জীবনের এবং সমস্ত বিশ্বাসকার্যে চন্দ্রাপীড় পত্রলেখাকে আত্মহৃদয় থেকে অতিরিক্ত মনে করত। নারীর সঙ্গে পুরুষের এই সম্বন্ধের মধ্যে লজ্জাবোধহীন অসংকোচ যে সম্পর্ক, তা একান্তভাবে সৌহার্দ্যের ওপর নির্ভরশীল; অনঙ্গ দেব এর মধ্যে কখনো প্রবেশের অধিকার পাননি। তাদের এই পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই আখ্যায়িকায় পত্রলেখা যে সুকুমার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে সেরূপ সম্বন্ধ আর কোনো সাহিত্যে কোথাও দেখি নাই। অথচ কবি অতি সহজে সরলচিত্তে এই অপূর্ব সম্বন্ধ বন্ধনের অবতারণা করিয়াছেন, কোনোখানে এই ঊর্ণাতন্তুর প্রতি এতটুকু টান পড়ে নাই যাহাতে মুহূর্তের জন্য ছিন্ন হইবার আশঙ্কামাত্র ঘটিতে পারে।' (১৩৫৯: ৭৮-৭৯)

অথচ ছিন্ন হওয়ার প্রচুর অবকাশ ছিল। চন্দ্রাপীড় দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, করীপৃষ্ঠে চন্দ্রাপীড়ের সম্মুখে আসীনা পত্রলেখা। শিবিরে চন্দ্রাপীড় যখন নিজ শয্যার অদূরেই সখা বৈশম্পায়নের সঙ্গে আলাপরত, তখন নিকটেই ক্ষিতিতলে নিঃশঙ্ক পত্রলেখা সুষুপ্তা। এমনকি চন্দ্রাপীড় যখন কাদম্বরীকে বধুরূপে গ্রহণ করেছে, তখনও পত্রলেখা এবং কাদম্বরী পরস্পরকে সহজভাবেই সখীরূপে গ্রহণ করেছিল; তাদের মধ্যে কোনো ঈর্ষা, সংকট, সংশয় বা বেদনা ছিল না। কিন্তু হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, কারণ চন্দ্রাপীড় যেমন পূর্বজন্মে ছিল দেবচন্দ্রমা, পত্রলেখাও তেমনি ছিল চন্দ্রমার অন্যতমা প্রেয়সী রোহিণী; অথচ কবি বাণভট্ট পত্রলেখাকে সেই প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রাখলেন। পত্রলেখাকে আর আমরা বধূরূপে দেখতে পেলাম না; কবি তাকে শুধু সেবাপরায়ণা করেই রাখলেন। কিন্তু পত্রলেখাকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করার মতো যাবতীয় রূপগুণই তার ছিল। কবি বাণভট্ট যাবতীয় রূপ-রস দিয়ে পত্রলেখাকে সৃষ্টি করে নির্মম চিত্তে বিসর্জন দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ দুঃখ নিয়ে বলেছেন, 'আমরা বলিব কবি অন্ধ। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার দিকেই ক্রমাগত একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র বন্দিনীটিকে (পত্রলেখাকে) তিনি দেখিতে পান নাই। ইহার মধ্যে যে প্রণয়-তৃষ্ণার্ত চিরবঞ্চিত একটি নারীহৃদয় রহিয়া গেল, সে কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন।' তিনি আরো বলেন, 'কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয় অন্য সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৫৯: ৮২)। পত্রলেখা কাব্যে উপেক্ষিতা হয়েই রইল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আধুনিক নারীর মানসিকতাকে স্পর্শ করতে পেরেছে এই প্রবন্ধে।

কালিদাস তাঁর *অভিজ্ঞানশকুন্তলম* নাটকে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে পূর্ণ মূল্য দেননি বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। শকুন্তলা যখন স্বামীগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, তখন ক্রন্দন সহযোগে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাকে বিদায় দেয়। এর বাইরে কিছু রঙ্গ-রসিকতা আর হাস্য-পরিহাসের

পরিসর ব্যতীত এদের উপস্থিতি চোখে পড়ে না। অনেকে দাবি করেন, শকুন্তলার সংকটকালে এদের সক্রিয় ভূমিকা নেই, কাজেই এই চরিত্রদ্বয়কে আমলে নেওয়ার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটাই মানতে পারেননি। পরিষ্কার বলেছেন, 'সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৫৯: ৭৬)। শকুন্তলা চরিত্রটিকে পূর্ণতা দান করেছে প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলার সঙ্গে যদি তার এই সখীদ্বয় থাকত, তবে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারতেন। এদের অনুপস্থিতির জন্যই খণ্ডিতা শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত চিনতে পারেননি। জীবন্ত এই চরিত্রদ্বয়কে তাই তুল্য মূল্য না দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে মেনে নেননি। তিনি লিখেছেন: 'এখন সেই সখীভাবনির্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে মর্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছি' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৫৯: ৭৮)। রবীন্দ্রনাথের চোখ উপেক্ষিতা চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি মন্ত্রের মানবরূপ দেখেছে, কেমন করে তাদের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তা দেখেছে। সে কারণে চরিত্রগুলোর প্রতি ঐকান্তিক দরদ অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর সাহিত্যবিচার নান্দনিক রসবোধে সমুত্তীর্ণ হয়েছে।

৯

সমকালীন নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক বিশ্বাস, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত একজন পাঠকের পাঠ-প্রকিয়াকে চালনা করে থাকে। সমালোচকও এর থেকে মুক্ত নন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নান্দনিক চেতনা সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃত সাহিত্য তিনি গভীর আবেগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন। 'পশ্চিমের জীবনরসধারা' ও 'ভারতীয় ভাবসাধনা' দুটিই তাঁর কলমে-মননে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাস্তব, জীবন্ত ও জীবনমন্থনকারী অভিজ্ঞতার জারক রসে জারিত করে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর সুগভীর অনুরাগ, সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়ন করে লেখা প্রতিটি প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত। মহাকবি বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, জয়দেব প্রমুখ কালজয়ী কবির কাব্যের সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে ভারতাত্মার মর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি-মানসকে আধুনিক ভারতের কবি-মানসের সঙ্গে যুক্ত করে ভালো-খারাপ আর ইতি-নেতির মধ্যে আটকে যাওয়া আমাদের সমালোচনা সাহিত্যকে দিয়েছেন প্রবল ধাক্কা; আর উন্মোচিত করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের নতুন সম্ভাবনা।

সহায়কপঞ্জি

অভিতাভ মুখোপাধ্যায় (১৯৮৯)। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন', *ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল* (মোহনলাল মিত্র ও কানাইলাল মিত্র সম্পাদিত)। কলকাতা: আলফা পাবলিশার্স কনসার্ন

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৭)। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

অসিতকুমার ভট্টাচার্য (২০০৭)। *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা*। কলকাতা: কে পী বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

কল্যাণীশংকর ঘটক (১৯৮০)। *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*। কলকাতা: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

কালিদাস (১৯৫৭)। *মেঘদূত* (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কালিদাস (১৩৯১)। *কালিদাসের মেঘদূত* (অজিত কুমার গুহ ও ফয়েজুন্নেসা অনূদিত)। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ

কালিদাস (১৯৯৪)। *মেঘদূতম্* (কানাই লাল রায় অনূদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

ক্ষিতিমোহন সেন (২০১০)। *কবীর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স

ক্ষিতিমোহন সেন (২০১৩)। 'দাদূ', *প্রাচ্য সংবাদ* বর্ষ ১ সংখ্যা ১ (আলোক রায় সম্পাদিত)। কলকাতা

ক্ষেত্রগুপ্ত (১৩৯১)। *মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প*। কলকাতা: এ কে সরকার অ্যাণ্ড কোং

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৫)। *রাজসভার কবি ও কাব্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

পম্পা মজুমদার (১৯৭২)। *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৬৭)। *রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক*। কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯৯৯)। *সমস্ত গল্প* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (২০০৩)। *সাহিত্যের সংসার*। কলকাতা: সাহিত্যলোক

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য (১৯৭৮)। *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (১৯৯১)। 'সাহিত্য-মীমাংসক রবীন্দ্রনাথ', *রবীন্দ্র-স্মারকগ্রন্থ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

বেগম আকতার কামাল (২০১৯)। *রবীন্দ্রকবিতার বাতায়ন*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ

মুমতাহানা মৌ (২০২০)। 'কালিদাসের মেঘদূত: নিসর্গ ও প্রণয়-প্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান', *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা-সাহিত্যপত্র* ৪৬তম সংখ্যা (নাহিদ হক সম্পাদিত)। ঢাকা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আজম (২০২০)। *কবি ও কবিতার সন্ধানে*। ঢাকা: কবিতাভবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৯)। *জীবনস্মৃতি*। কলকাতা: আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৩৬)। *শেষের কবিতা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫৬)। 'সাহিত্যবিচার', *সাহিত্যের পথে*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫৯)। *প্রাচীন সাহিত্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫৯)। 'স্বপ্ন', *কল্পনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৮১)। *মানসী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৮৪)। 'বসুন্ধরা', *সোনার তরী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০০। 'বাঁশি', *পুনশ্চ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬)। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', *রবীন্দ্র-রচনাবলি* ষড়্‌বিংশ খণ্ড (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত)। ঢাকা: ঐতিহ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬)। 'পূর্ব ও পশ্চিম'। *রবীন্দ্র-রচনাবলি* দ্বাদশ খণ্ড (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত)। ঢাকা: ঐতিহ্য

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩৫৮)। *ঋগ্বেদ সংহিতা* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী

রোমিলা থাপার (২০১১)। *ভারতবর্ষ: ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্য ধারণা* (আবীরা বসু চক্রবর্তী অনূদিত)। নয়াদিল্লী: নয়াদিল্লী ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৯৬)। *ত্রয়ী*। কলকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯৫৭)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০১৫)। *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

সাধনা রায় (১৯৯৮)। *মধুসূদন-সাহিত্যে প্রাচ্য প্রভাব*। কলকাতা: সাহিত্যলোক

সুকুমার সেন (১৯৯২)। *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

সুকুমার সেন (১৯৯৬)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স

সুবোধচন্দ্র দাস (২০১৮)। *সন্ত কবীরের পূর্ণিমাব্রত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা*। কলকাতা: র‍্যামন পাবলিশার্স

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯১)। *রবীন্দ্রনাথ: কাব্য বিচারের ভূমিকা*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯৬৪)। 'বাঙ্গালার সাহিত্য: বর্তমান শতাব্দীর', *হরপ্রসাদ রচনাবলী* (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)। কলকাতা: ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোং

Arnold, Matthew (1932). *Culture and Anarchy.* UK: Cambridge University Press

Aurobindo, Sri (1965). *Bankim Chandra Chatterjee.* Pondicherry: Sri

Azam, M. (2022). পোস্টমাস্টার ও রতনের সম্পর্ক কি কলোনিয়াল? *সাহিত্য পত্রিকা - Shahitto Potrika / University of Dhaka*, 215–239. https://doi.org/10.62328/sp.Centennial-Special-Issue.11

Azam, M. (2023). অগ্নি-বীণার নান্দনিকতা ও এর সমাজতত্ত্ব. *সাহিত্য পত্রিকা - Shahitto Potrika / University of Dhaka*, *58*(1–2), 25–46. https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.2

Chatterjee, Partha (1993). *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse.* Minneapolis: University of Minnesota Press

Dasgupta, Subrata (2007). *The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohan Roy to Rabindranath Tagore.* Delhi: Permanent Black

Fox, Ralph (1937). *The Novel and the People.* New York: International Publications

Nandi, Ashis (1989). *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism.* Delhi: Oxford University Press

Roy, Niharranjan Roy (1981). 'Orientalism: A Critique', *Indian Quarterly* Vol 37 No 03. New Delhi

Said, Edward W (1978). *Orientalism.* New York: Pantheon

Scholar, R (1984). *The Oriental Renaissance: Europe's Rediscovery of India and the East (1680-1880),* New York: Columbia University Press

Smith, Vincent A (1914). *The Early History of India.* Oxford: Clarendon Press

Ullman, Walter (1965). *A History of Political Thought in the middle ages.* London: Pelican original